ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 91-97
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.437

বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন: নির্বাচিত বনফুলের ছোটগল্প

সেখ সামিরুল ইসলাম, *গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 31.03.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract
Banaphul is a distinguished figure in Bengali literature. He made significant contributions to the genre of the short story. A defining characteristic of his short fiction is his ability to convey profound resonance within a remarkably concise scope; by eschewing superfluous elaboration, he compels the reader to engage in deep reflection. Without explicitly stating anything directly, he employs subtle cues across just a few lines to convey a wealth of meaning, thereby illuminating some of the profound truths of life. For instance, in his story 'Nimgaachh' by depicting the utility— as well as the subsequent neglect— of a neem tree, he poignantly highlights the exploitation and helplessness faced by housewives within our society. Another short story is 'Chhotolok'. Through a brief conversation between just two characters, this story portrays an entire society— a society in which the powerful have ceaselessly looked down upon the weak, treated them with condescension, and deemed them 'chhotolok.' The narrative conveys the profound insight that those whom society labels as 'chhotolok' actually possess a sense of self-respect and are, in reality, not 'lowly' at all. The story 'Budhni' portrays the dynamics of marital relationships— alongside scenes of their cruelty—within a primitive, forest-dwelling hill tribe. In the story 'Jagrata Devata,' the author has masterfully depicted the dire consequences of blind superstition. Indeed, the manner in which Banaphul brings to life the diverse and harsh realities of existence within the concise scope of his short stories constitutes a feat of such distinction that it is achievable only by him.

Keywords: Banaphul, Nimgach, Chhotolok, Chotogalpo, Onugalpo, Nari Shosoner Galpo, Balaichand Mukhopadhyay, Jagrata Devata, Budhni

পেশা ডাক্তার হলেও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুলের চিরজীবন নেশা ছিল সাহিত্য রচনা। তাঁর জান্ম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্র সময়ে লিখলেও রবীন্দ্র অতিক্রমী লেখক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তার অনেক রচনায় জীবনের এমন কিছু প্রগতিশীলতার প্রতিফলন ঘটছে যা আমরা বাংলা সাহিত্যে এর আগে দেখিনি। উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গল্প প্রতিটি রচনাতে ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। তবে তার শ্রেষ্ঠত্ব ছোট গল্পে। তার ছোট গল্পের মধ্যে অনবদ্য সৃষ্টি হল খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে গল্প লিখে তার মধ্যে একটি বৃহৎ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা। এ যেন বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। এ ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে সিদ্ধহস্ত। এই গল্পগুলি এক থেকে দেড় পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গল্পে তেমন কোনো প্রচলিত চরিত্রাঙ্কন, ভূমিকায়ন বা দীর্ঘ

বর্ণনা নেই। কিছু আভাস বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে গল্প এগিয়ে চলে, পরিণতিতে কোন একটি বিষয়কে উপলক্ষ করে এমন এক বিস্ময়কর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন যা আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। প্রসঙ্গত অধ্যাপক সরোজ মোহন মিত্র লিখেছেন–

> "তিনি অতি সংক্ষেপে ভূমিকা ও সম্প্রসারণের কাজ সেরে একেবারে ক্লাইম্যাক্সে চলে আসেন। সেজন্য তাঁর গল্পের পরিধিও অতি সংক্ষিপ্ত। সেই কারণে প্রচলিত অর্থে আমরা যেগুলিকে ছোটোগল্প বলি বনফুলের এক পাতার বা তারও কম প্রিসরের গল্পকে তা বলা চলেনা। মোহিতলাল এগুলোকে চুটকি গল্প বলেও অভিহিত করেছেন।"[১]

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত এরকমই একটি গল্প 'নিমগাছ', যা 'দৃশ্যলোক' নামক গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটির পরিধি মাত্র ২৬ লাইন। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরেই একটি করুন আবেগঘন জীবনচিত্র অঙ্কন করে একটি জীবনের গভীর বাস্তব সত্যকে উপস্থাপন করেছেন লেখক। গল্পটি শুরু হয়েছে একটি নিম গাছের কথা দিয়ে। নিম গাছ, যা আমরা সবাই চিনি। এই নিম গাছ আমাদের জীবনে অসুস্থতা থেকে আরোগ্যের জন্য বিশেষ উপকারী। তাই লেখক বলছেন কেউ ছাল ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে, কেউ পাতাগুলো ছিড়ে পাথরে পিষে নিচ্ছে। নিমগাছটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে এই অত্যাচারে তারও যে কষ্ট হতে পারে তা কেউ ভেবে দেখে না। কেউবা গরম তেলে নিমপাতা ভাজে দাদ, হাজা, চুলকানিতে লাগবে বলে। আসলে চর্মরোগের আরোগ্যে নিমগাছের জুরি আর নেই। অনেকে এর কাঁচা পাতা ছিঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। কিংবা বাড়িতে নিম বেগুন ভাজা খায়। যকৃত এর জন্য যেমন উপকারী তেমনি দাঁত ভালো রাখার জন্য অদ্বিতীয় এই নিম গাছ। তাই নিমের ডাল কেউ ভেঙে নিয়ে যায় দাঁত ঘষার জন্য। কবিরাজ নিম গাছের উপকরণ দিয়ে তার কবিরাজি করে মানুষের উপকার করে নিজে প্রশংসিত হয়, তাই নিম গাছের বদৌলতে স্বার্থ সিদ্ধি হয় বলে নিম গাছের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ। এই গাছ বড় করার জন্য কোনো কঠিন পরিশ্রম করতে হয় না। গাছ বাড়ির পাশে আপনা আপনি জন্মায়। অবহেলায় অযত্নে বড় হতে থাকে। উপকারী বলে বিজ্ঞরা খুশি হয়, কাটতে দেয় না। কিন্তু গাছটির যত্ন কেউ নেয় না। যত্ন না নেওয়ায় যত আবর্জনা এই গাছের চারিদিকে জমা হয়।

তবে সব মানুষতো এক হয় না। ব্যতিক্রমী মানুষও আছে। বনফুল তাদের বলেছেন কবি। এক কবিরূপী মানুষ এই নিম গাছের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তার ডাল ভাঙে না, তার ছাল তোলে না। নিম গাছটির পাতা ফুলের প্রকৃত সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়। তাকিয়ে থেকে মনের খোরাক মিটিয়ে চলে যায়। লেখকের মনে হয়, নিম গাছটা বুঝি সেই মানুষটির সঙ্গে চলে যেতে চাইছে। কারণ এত মানুষ তার থেকে উপকৃত হয়, কিন্তু তার মর্মের গুরত্ব কেউ দেয় না। এই একটি মাত্র লোকই তার স্বার্থের জন্য, ব্যবহারের জন্য, প্রয়োজনের জন্য গাছটির উপর কোন উপদ্রব করলো না। কোথায় আছে, কোনো ফুলে যার ভাললাগে সে ফুলটিকে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু কেউ ফুলটিকে যে প্রকৃত ভালোবাসে সে সেই ফুলগাছের গোড়ায় জল দেয়। এখনে নিমগাছ ও কবির মধ্যেও যেনো তেমনই। নিম গাছ সেই কবির মধ্যে হয়তো প্রশান্তি খুঁজে পেয়ে তার সঙ্গেই চলে যেতে চায়। কিন্তু যেতে পরে না। কারণ তার শিকড় চলে গেছে মাটির অনেক গভীরে, ভিতরে, অনেক দূরে। তাই বাড়ির পিছনে আবর্জনারর স্তুপের মতোই অযত্নে দাঁড়িয়ে থাকে নিমগাছটি। গল্পের শেষ বাক্যে লেখক বলেছেন "ওদের বাড়ির গৃহকর্ম- নিপুনা লক্ষ্মী বউটার ঠিক একই দশা।"

আসল গল্প আসলে এই বাক্যটিতেই। নারীরা আমাদের সমাজে আজও অবহেলিত, নির্যাতিত। তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, সেই নিম গাছটির মতোই। গৃহবধূ হয়ে আসা শ্বশুর বাড়িতে একটি মেয়েকে কত কষ্টই না করতে হয়, নিম গাছকে যেমন সবাই ব্যবহার করে তেমনি গৃহবধূও শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী পরিবারের অন্যান্যদের সেবায় যত্নে নিয়োজিত থাকে রাত দিন, কিন্তু তার যত্নের কথা কেউ ভাবে না।

একটি নিম গাছের উপমায় লেখক গৃহবধুর এই অসহায় অবস্থাটিকেই দেখালেন। কিন্তু সেই কবি মনের মানুষটির মতোই কেউ আছে যে সেই মেয়েটিকে কষ্ট দেয় না, তাকে দিয়ে নিজের সাধ্য সিদ্ধি করে না। তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়, তার প্রশংসা করে, তাকে ব্যবহার না করে শুধু ভালোবাসে। বধূটির মনে হয় সেই কবিসুলভ মানুষটির সঙ্গে চলে যেতে এই পবিবার ছেড়ে। কিন্তু যেতে পারেনা, নিমগাছটি যে মাটির ভিতরে অনেক দূরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তেমনি এই বউটি সম্পর্ক, দায়বদ্ধতায়, এই সংসারের সঙ্গে এত গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে যে, তার পক্ষে এখান থেকে সরে যাওয়া সম্ভব হয় না। মানুষের এত উপকারী নিম গাছ যেমন আবর্জনার স্তুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, কাউকে কোনো অভিযোগ করার ক্ষমতা নেই তার। তেমনি এই লক্ষী বউটিকেও প্রচলিত সমাজের রীতি মেনে, সমাজের প্রয়োজনে নিরবে প্রতিবাদহীন বোবা হয়ে থাকতে হয়। এবং তার সব কাজ এবং দায়ভার পালন করে যেতে হয়। গাল্পটি সম্পর্কে সমালোচক সুজাতা বাগ বলেছেন–

> "বনফুলের গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তীক্ষ্ণ বাস্তবতা। গল্প রচনার ক্ষেত্রে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তিনি বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন, তাই বলে তাঁকে আবেগহীন, মমতাহীন বলা যাবে না। আপন কল্পনাকেও তিনি মুক্তি দিয়েছেন গল্পে। কিন্তু আবেগের জোয়ারে ভেসে যায়নি কল্পনা। তার মূল সুরটি বেঁধে রেখেছেন বাস্তবের শক্ত মাটিতে। গল্পের শুরু থেকে নিমগাছের বর্ণনা বাস্তবসম্মত ভাবেই চলছিল। হঠাৎ কবি চরিত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের আবেগ মিশ্রিত কল্পনা যেন মুক্তি পেতে চেয়েছে। লেখকের কল্পনাকে ভর করে পাঠকের কল্পনাও যেন পক্ষ বিস্তার করতে চায়। কিন্তু তাকে দীর্ঘায়িত না করে শেষের একটি বাক্যে রূপকের আবরণ ভেদ করে পাঠককে তীক্ষ্ণ বাস্তবের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আধুনিক সাহিত্যে বিশেষত ছোটগল্পে বাস্তবতা একান্তভাবে প্রত্যাশিত, 'নিমগাছ' গল্পটির শিকড় সেই বাস্তবের মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত বলেই, পাঠকের মনোভূমিতে এ গল্পের আবেদন মহীরূহের মত বিস্তারিত হতে পেরেছে।"[২]

গল্পটি অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। লেখক একবারও বাড়ির বউটির অসহায় করুন জীবনের কথা তুলে ধরেন নি, কিন্তু আমাদের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে তার দশা কিরূপ। সুতরাং কিছু না বলেও যে কিছু সংকেতের মাধ্যমে অনেক কিছু বলা যায়। বনফুল সে বিষয়ে সিদ্ধহস্ত।

বনফুলের আরেকটি ছোট গল্প 'ছোটলোক', এ গল্পটি বনফুলের ১৩৫১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রকাশিত 'বিন্দু বিসর্গ' নামক গল্প সংকলনের অন্তর্গত। এই গল্পেও লেখক স্বল্প পরিসরে খুব অল্প কথায় একটি বৃহৎ জীবন দর্শনকে তুলে ধরেছেন।

এই গল্পের চরিত্র মাত্র দুটি একজন রাঘব সরকার। তার বর্ণনায় লেখক বলেছেন 'উন্নতমস্তক', 'সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণকারী অনমনীয়-চরিত্র'। তিনি কারো অনুগ্রহের প্রত্যাশী নন, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, কিন্তু কারো উপকার দ্বারা উপকৃত হন না। জীবনের সর্বদা মাথা উঁচু করে রাখাই তার জীবনের সাধনা। অন্যদিকে আরেক চরিত্র 'অস্থিচর্মসার' এক রিকশাওয়ালা, যে অত্যন্ত গরিব।

দুপুরে নিদারুণ রৌদ্রে দ্রুত রাস্তা দিয়ে হাঁটছে রাঘব সরকার। পথে সেই রিকশাওয়ালা তার প্রয়োজনের তাগিদেই তার পিছু নিয়েছিল, ভেবেছিল যদি বাবুটি রিকশা করে যায় তাহলে কিছু আয় হবে। কিন্তু সে জানতো না যে এই বাবুটি কখনো রিকশায় চড়ে না। রিকশা চড়া রাঘবের কাছে যেন মানুষের কাঁধে চড়া, যা নিতান্ত পাপ মনে করেন তিনি। তাই রিকশাওয়ালাকে প্রতমত নাকচই করে দিয়েছেন। কিন্তু যখন সেই রিকশাওয়ালা তার পিছু ছাড়েনি। তখন সে ভাবে গরিব রিকশাওয়ালাটির এই বুঝি অন্ন সংস্থানের একমাত্র উপায়। তিনি পিছু ফিরে রিকশাওয়ালার দিকে দেখলেন যে সে 'জীর্ণশীর্ণ অনাহার ক্লিষ্ট'। তার মনে দয়ার সঞ্চার হলো। তাই

তিনি শিবতলা পর্যন্ত যাবেন বলে রিকশাওয়ালাকে বললেন, ভাড়াও জেনে নিলেন। কিন্তু রাঘব রিকশায় না চড়ে হেঁটে যেতে থাকলেন এবং রিকশাওয়ালাকে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে বলেন। রিকশাওয়ালা যেতে যেতে বার বার বলতে লাগলো 'আসুন বাবু চড়ুন' কিন্তু রাঘব না চড়ে শুধু তাকে ডেকে নিয়ে যেতেই থাকে। এভাবে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়। রাঘব রিকশাওয়ালাকে এই রাস্তা তার সঙ্গে যেহেতু হেঁটে এসেছে তাই উপযুক্ত ভাড়া দিতে যায়। রাঘব সরকার যেমন আদর্শবাদী তেমনি রিকশাওয়ালারও আত্মমর্যাদা কম নয়। সে যখন রাঘব সরকারের কাছ থেকে শোনে যে তিনি রিকশা ওঠেন না, অর্থাৎ এই ভাড়া দয়া করে দিচ্ছে। তখন জানায় রিকশা চড়া পাপ একথা আগে বললে এতটা পথ আসতো না। কাউকে রিকশায় না চড়িয়ে তার কাছে পয়সা নেওয়া তার কাছে ভিক্ষা নেওয়ার সমান। আবারো রাঘব পয়সা দিতে চাইলে রিকশাওয়ালা বলে "আমি কারো কাছ থেকে ভিক্ষা নিই না"। এই বলে ঠুন ঠুন করে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাঘব সরকারের উন্নত মস্তিষ্ক যেনো অবনত হলো।

গল্পে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে রিকশাওয়ালাটি রাঘব সরকারের কাছে 'ছোটলোক' ছিল। কিন্তু গল্পের শেষে আচরণের ও মানসিকতায় রিকশাওয়ালাটির যেনো চারিত্রিক উন্নতি ঘটেছে, আর উন্নতমস্তিষ্ক রাঘব সরকারই যেন কোথাও ছোটলোকে পরিণত হয়েছে। এই গল্পে স্বল্প পরিসরের দুটি মানুষের সামান্য কথোপকথন ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যেনো ফুটে উঠেছে এক পুরো সমাজ। যে সমাজে বুর্জোয়া ও শ্রমজীবীদের মধ্যে চলে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব। যে সমাজে উচ্চ শ্রেণী সর্বদাই আর্থিক দিক থেকে দুর্বলদের চিরদিন হেয় চোখে দেখেছে, অবজ্ঞা করেছে, করুণা করেছে। কিন্তু দুর্বলরাও যে চেতনার আর্দশে সচেতন তা লেখক দেখিয়েছেন। তারা কখনো সবলদের কাছে ছোট হতে চায় না। গল্পটি সম্পর্কে সমালোচক চৈতালী ব্রহ্ম বলেছেন–

> "এই দু'পাতার গল্পটির মধ্য দিয়ে দুটি ভিন্ন শ্রেণীচরিত্র, তাদের অবস্থান ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যে বিশ্লেষণী অনুপুঙ্খ ফুটে উঠেছে, তা দুটি ভিন্ন শ্রেণীর তুমুল বিভেদ ও বৈষম্যকেই প্রমাণ করে। এই দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হল শোষক ও শোষিত শ্রেণী, যাদের এখানে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া ও সর্বহারা বা প্রলেতারিয়েত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শ্রেণী তথা সামাজিক গোষ্ঠী, অর্থাৎ যে এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে, এরকম ভোগী ও লাভবান গোষ্ঠী বা শ্রেণী হল মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া, যার প্রতিভূ রাঘব সরকার। অপর দিকে যে গোষ্ঠীর শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে তাদের শোষণ করে নিঃস্ব করে ফেলা হয়, তারা হল সর্বহারা, যার প্রতিভূ সেই রিক্সাওয়ালা। এই দুটি চরিত্র এবং তাদের পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে দুটি চরিত্র তথা দুটি শ্রেণীর রূপের প্রকাশ তথা শ্রেণীচরিত্র উদ্‌ঘাটনই এই গল্পটির মূল উদ্দেশ্য।"[৩]

আসলে বনফুলের গল্পে ভাষার কোন চমক নেই, সহজ সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি গল্পগুলি রচনা করেছেন। কিন্তু খুব অল্প কথায় সহজ সারাল ভাষায় যে অনেক কিছু যে বলে নেওয়া যায়, অনেক গভীর ও বৃহৎ ব্যঞ্জনা তৈরি করা যায় তা যেনো সার্থক ভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন তার ছোটগল্পের মাধ্যমে। আমাদের আলোচ্য গল্পদুটি বনফুলের এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যধর্মী ছোটগল্প।

'বুধনী' বনফুলের আরেকটি অতি সংক্ষিপ্ত গল্প। এই সংক্ষিপ্ত গল্পের মধ্যে এক জোড়া বন্য, বর্বর নর-নারীর প্রেম কাহিনী ও তার ট্রাজিক পরিণতিকে দেখানো হয়েছে। গল্পটির ঘটনার প্রেক্ষাপট হাজারীবাগের পার্বত্য প্রদেশের জঙ্গল অঞ্চল। সেখানকার মানুষের অনুভূতি, প্রবৃত্তি আচার-আচরণ, রীতিনীতি ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি যে সভ্য সমাজের সঙ্গে কতটা পৃথক তার পরিচয় আমাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু সাবলীল ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। এত সাবলীল ভাবে যে আমাদেরও কিছু মুহূর্তের জন্য মনে হয় আমরাও বুঝি হাজারীবাগের জঙ্গল ঘুরে এলাম। গল্পটি সম্পর্কে সমালোচকের মত-

> "মানব জীবনের জৈবিক তাড়নায় যৌবনের উদ্মাদনায় মিলিত হয়েছে একজোড়া অন্ত্যজ নরনারী।- তাদের বর্বর জীবনের প্রণয় লীলা আলোচ্য গল্পের মূল বিষয়।"[৪]

হাজারীবাগের পর্বত পাদদেশের জঙ্গল অঞ্চলের পল্লীতে বাস করে বিলটু নামক এক যুবক। এ অঞ্চলের অন্যদের মতোই সে ধনুক নিয়ে শিকার করে বেড়ায় জঙ্গলের এদিক- ওদিক। শিকার করতে করতে একদিন দেখা পায় 'নিকষ- কৃষ্ণাঙ্গী' কিশোরী বুধনীর। যেহেতু সভ্য মানুষজনের থেকে তারা কিছুটা ভিন্ন, কিছুটা বন্য, তাই বিলটুর স্বভাবেও দেখি এই বন্যতার ছাপ। বিলটু বন্য পশুর মতই তাড়া করেছিল বুধনীকে। ত্রস্ত হরিণীর মত পালিয়ে বেঁচেছে সে যাত্রায় বুধনী। কিন্তু বিলটু তাকে ভুলতে পারিনি। এরপর বুধনীকে দেখলেই তাকে তাড়া করতো। শেষে কিন্তু বিলটু বিয়ে করেছে বুধনীকেই।

এই বিয়ে উপলক্ষে এই অঞ্চলের বিচিত্র একটি প্রথার সঙ্গেও আমাদের পরিচিতি ঘটিয়েছেন লেখক। এই পল্লীতে কখনো কখনো সকালে মাঠে সভা বসত। এই সভায় অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা আসতো। সেখানে একটা পাত্রে রাখা থাকতো সিঁদুর। কোন অবিবাহিত ছেলের যদি কোন অবিবাহিত মেয়েকে পছন্দ হয়, তাহলে সেই ছেলেকে সেই কুমারী মেয়ের কপালে সেই সিঁদুর লাগিয়ে দিতে হতো। কিন্তু এটা এত সহজ বিষয়ে নয়। এর জন্য ছেলেটিকে নিতে হবে প্রাণীর ঝুঁকি। এই কাজের জন্য ছেলেটির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কেননা সেদিন নিয়মানুসারে সেই কুমারীর আত্মীয়-স্বজন তৎক্ষণাৎ ধনুক, বল্লম ইত্যাদি প্রাণনাশকারী অস্ত্র নিয়ে এই যুবককে তাড়া করবে। যুবক যদি তা থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে না পারে তাহলেই নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু সে যদি সমস্ত দিন আত্মরক্ষা করতে পারে তাহলে সূর্যাস্তের পর আত্মীয়-স্বজনরা মহা আনন্দে বিবাহের রীতি মেনে বরের গৃহে কন্যাকে পৌঁছে দেবে। এভাবেই বুধনীকে জয় করেছিল বিলটু। লক্ষণীয় এই যে বিলটু জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বুধনীকে পাওয়ার সংগ্রাম করেছে ও সফল হয়েছে। এ তো এক ধরনের প্রেমিকেরই সংগ্রাম।

এই বিলটু ও বুধনী যাদের গল্পকথক 'অসভ্য' ও 'জংলি' বলে সম্বোধন করেছে, তাদের মিলনের পর বিলটুর বুধনীর কাছে প্রেম প্রকাশের ভঙ্গি কিরকম ছিল তা অনুমান করতে পারিনি গল্পকথক। গল্পকারের বর্ণনায়

> "যাহারা গুহা-নিবাসী সুপ্ত শার্দুলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ অবলীলাক্রমে ওঠে নামে, পূর্ণিমা নিশীথে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়-তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।"[৫]

বিলটু কিন্তু বুধনীকে বিয়ে করার পর তাকে এক দন্ডও ছাড়েনি। বনে-জঙ্গলে, গুহায় এই দম্পতি একসঙ্গে বিচরণ করে বেড়াতো। কিন্তু এর পরেই আসে এক বিপর্যয়। বুধনী একটি সন্তান প্রসব করে। এই সন্তানকে পেয়ে বুধনী আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে গল্পের বর্ণনায় –

> "বর্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরের সন্তান-লিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধনী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল!"[৬]

কিন্তু বিলটু খুশি হতে পারল না। সে দেখলো বুধনীকে, যাকে সে সবসময় তার কাছে পেতে চায়, সেই বুধনীকে অনেকটাই দখল করে নিয়েছে সদ্যোজাত শিশুটি। বুধনী শুধু আর বিলটুর একার নয়, তার সন্তানেরও। বিলটুকাছে একটা অসহ্য হয়ে উঠল। তাই সে নৃশংসভাবে হত্যা করে তার নিজেরই সন্তানকে। আইনের চোখে সে দোষী। তার ফাঁসি হবে। গল্পকথক জেলখানায় বেড়াতে গিয়ে বিলটু আর্তনাদ ও চিৎকার শুনেছে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত চিৎকার করে গেল '-বুধনী -বুধনী -বুধনী -বুধনী'। ভগবানের নাম পর্যন্ত নেয়নি। নিশংস ভাবে শিশু হত্যা করেছে বলে কারো সহানুভূতি ছিল না তার প্রতি।

আসলে বিলটুর অন্তরটাকে যদি আমরা দেখি তাহলে তার মধ্যে একটা প্রেমিক সত্তাকেই পাব। কিন্তু সে প্রেম হয়ে উঠেছে বর্বর। সে বুধনীকে এতটাই ভালোবেসেছে যে নিজের সন্তানকেও তার পাশে সহ্য করতে পারেনি। পাহাড়ি জঙ্গলে সভ্য আলোর অভাবে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের অভাবে, বিলটুর প্রবৃত্তি তাড়িত প্রেম হয়ে উঠেছে নৃশংস। অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রান্তিকায়িত এক জনসমাজের এ দম্পত্তির বর্বরতার চিত্র এমন সাবলীল ভাবে ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা একমাত্র বনফুলের পক্ষেই সম্ভব।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখা বনফুলের আরেকটি ছোট গল্প 'জাগ্রত দেবতা'। গ্রামীণ মন্দিরের দেবতাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস কতটা মর্মান্তিক পর্যায়ে যেতে হতে, তা খুব সংক্ষেপে এই গল্পের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। গ্রামের মন্দিরে দেবতাকে জাগ্রত বলে প্রচার না করলে সেখানে ভক্তি আসে না, আর তার জন্য কিছু সাধারণ বিষয়কে দেবতার সঙ্গে সংযুক্ত করে অলৌকিক প্রতিপন্ন করে প্রচারিত হয়। এই গল্প সেরকমই এক গ্রামের দেবতার গল্প।

সনাতনপুর গ্রামের এক জীর্ণ মহাদেবের মন্দির। যার যত্ন সেভাবে গ্রামের কেউ করে না। তাইতো এর আশেপাশে কচুবন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দিনের শেষে মহাদেবের মাথায় এক ফোঁটা জলও কেউ হয়তো দেয় না। কিন্তু গ্রামে প্রচারিত হয় যে, মহাদেব জাগ্রত। এই মহাদেবের যে জাগ্রত জন্য অন্ধবিশ্বাসী মানুষের কাছে যে সকল ঘটনা প্রচার করা হতো সেগুলি এরকম- বিপিন চৌধুরী এই মহাদেবের কাছে মানত করে মোকদ্দমায় জিতেছে এবং বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে। পালদের বাড়ির ছেলেটাকে তার মা এই মহাদেবের কাছে ধরনা দিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। মুখুজ্যদের এই মহাদেবের কৃপায় আজ বিশাল বার বারান্ত হয়েছে, মহাদেবই নাকি স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে পাটের ব্যবসা করতে বলেছে। হরিহর ঘোষাল লটারিতে টাকা পেয়েছে নাকি এই মহাদেবের কাছে মানত করেই।

কোন দেবতাকে জাগ্রত প্রমাণিত করতে গেলে কিছু অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ জরুরী। এই ঘটনাগুলি সেরকমই ঘটনা। ঘটনাগুলি হয়তো স্বাভাবিক ভাবে এমনি এমনি ঘটতো, কিন্তু দেবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সেই ঘটনাগুলিতে দেবতার দ্বারা রয়েছে বলে প্রচার করে দেবতাকে জাগ্রত প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলি ছাড়াও দেবতা যে জাগ্রত তার আরেকটি বিশ্বাস গ্রামের মানুষের মনে গেঁথে আছে। সেটা এই যে- প্রতি বছর এই মহাদেবকে কেন্দ্র করে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন প্রকাণ্ড উৎসব হয়। খাওয়া দাওয়া হয়। সেদিনই হয় এক অলৌকিক ঘটনা। গ্রামের কোন না কোন লোক সেদিন পাগল হয়ে যায় তাদের বিশ্বাস "পাগল ভোলানাথ প্রতিবছর একজনকে তাহার নিজের দলে টানিয়া লন।"[৭] এই মিথ্যে বিশ্বাসগুলি গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে লালন করে এসেছে।

সে বছরও এই উৎসব ঘটা করেই হয়েছে। চৌধুরীবাবুর বাড়িতে পায়েস রান্না হয়েছে। মেলাও বেশ জমে বসেছে। কিন্তু মেলার পর দিন সবাই একটু অবাক হল, কেননা শোনা গেল এবছর কেউ পাগল হয়নি। তাদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস এভাবে ভেঙে যাবে এ তারা কোনভাবেই মেনে নিতে পারল না। গ্রামের ছেলে যাদব যখন বলে সে ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখেছে কেউ পাগল হয়নি তখন নীলমণি ধমক দিয়ে বলে–

> "তুমি তো সেদিনকার ছোঁড়া হে, তোমার কথার আবার মূল্য কি! তোমার কথায় কি চিরকালের নিয়ম উল্টে যাবে? নিশ্চয়ই হয়েছে কেউ না কেউ পাগল, এখনও জানা যায়নি!"[৮]

আসলেই যখন পরদিন পাগল পাওয়া গেল না তখন সনাতনপুরবাসী মনে মনে শঙ্কিত হলেন, অন্ধবিশ্বাস আবার বাড়তে থাকলো, তারা এবার ভাবলো এবার তাহলে বড় কিছু অমঙ্গল হবে। কিছু মহিলা বলল এতো কর্মের ফল, বছরে একদিন মাত্র ঘটা করে পূজা করা হয়, কিন্তু বাকি দিনগুলোতে তো গ্রামবাসী মহাদেবের

কাছেও যায় না জল পর্যন্ত কেউ দেয় না। শিবের মাথায় দেবতা কতদিনে সব সহ্য করবে এতদিন সয়ে গেছে, আর নয়। কেউ আবার এবছরের পুরোহিত কে দোষ দিলেন। মোট কথা এবছর কেউ পাগল হয়নি এ নিয়ে গ্রামের মানুষের মনে বড় আশঙ্কা। এক আতঙ্ক বাসা বাঁধে যে কিছু একটা অমঙ্গল হবে।

অন্ধবিশ্বাসীদের মধ্যে আবার কেউ কেউ থাকে দৃঢ় অন্ধবিশ্বাসী। তেমনি গ্রামের একজন নীলমণি। তার বিশ্বাস, যে প্রথা, যে অলৌকিকতা মহাদেব এতদিন করে এসেছেন এবার তার পরিবর্তন হতেই পারে না। তার এও বিশ্বাস, নিশ্চয়ই কেউ পাগল হয়েছে। তারপর দেখা যায়, বৈশাখের দুপুরের রৌদ্রে, গরমের চারিদিক যখন পুড়ে যাচ্ছে, সবার বাড়িতে জানালা দরজা বন্ধ। কেউ গরমে বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না। তখন কেবল অন্ধবিশ্বাসী নীলমণি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরমে তার 'রক্ত চক্ষু স্ফীত-নাসা'। ঘরে ঘরে গিয়ে সে খোঁজ করছে, পাগল টা কোথায় গেল। গ্রামবাসী সবাই নিশ্চিত হলেন যে জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে। অর্থাৎ এবার নীলমণি পাগল হয়েছে। আসলে অন্ধবিশ্বাস যে মানুষকে কতটা পাগল করে দিতে পারে, এই গল্পই তার সার্থক প্রমাণ। গল্পের পরিসর প্রতি অল্প, কিন্তু বনফুল তার গল্পের সেই 'বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন' বৈশিষ্ট্য মেনে, কোন অতিরিক্ত বর্ণনায় না গিয়ে দ্রুত ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়েছেন। এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে এক সমাজ জীবনের অন্ধবিশ্বাসের পরিণতিকে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত সমালোচক রাজেন্দ্রপ্রসাদ দে বলেছেন–

> "ইচ্ছা করলেই গল্পটি বেশ বড়সড় করা যেত। গ্রামের একটা মনোহারী বর্ণনা, বড়লোকেদের বাড়ির ঘটা, গরীবদের দুর্দশা, উৎসবের জাঁকজমক, চরিত্র আরও কিছু বাড়িয়ে সংলাপগুলি আরও নাটকীয় করা যেত। বর্ণনা ও সংলাপের রস আরও গাঢ় করা যেত এবং এক চিমটে স্মিত হাস্যরস ছাড়াও পরিমাণমত অন্যান্য রসগুলোও মিশিয়ে জিনিসটা কড়াপাকের করা যেত। মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্ব বেশ করে আলোচনা করা যেত। ক্লাইম্যাক্সে পাগলের দু'চারটি অট্টহাস্য উদ্রেককারী ঘটনা বলা যেত। সৌভাগ্যের বিষয় এতসব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, সে সবের অপব্যবহার না করে যে বাক সংযম এখানে দেখানো হয়েছে তা গল্পটিকে নতুন আঙ্গিকের একটি সার্থক ছোটগল্পে পরিণত করেছে।"[৯]

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, সরোজ মোহন। প্রজ্ঞাবিকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৩১।
২. বাগ, সুজাতা। নিমগাছ: সার্থক অণুগল্প। মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার (সম্পা.)। গল্পচর্চা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃ. ৫১৭।
৩. ব্রহ্ম, চৈতালী। ছোটলোক: এক বিচিত্র চরিত্রের উদ্ভাস। মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার (সম্পা.)। গল্পচর্চা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃ. ৪৮৫।
৪. মন্ডল, তপন। বুধনি: বর্বর জননীর মাতৃত্ব। মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার (সম্পা.)। গল্পচর্চা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃ. ৫১৭।
৫. বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৩।
৬. তদেব, পৃ. ৬৩-৬৪।
৭. তদেব, পৃ. ৩৯৮।
৮. তদেব, পৃ. ৩৯৯।
৯. দে, রাজেন্দ্রপ্রসাদ। জাগ্রত দেবতা: বিশ্বাস একটা সাংঘাতিক জিনিস। মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার (সম্পা.)। গল্পচর্চা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃ. ৫০৬।